মানুষ
পৃথিবীর অনুপযোগী এক প্রাণী

নজরুল ইসলাম টিপু

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

ভূমিকা

বইটি শুরু হয়েছে প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হওয়া মানবাকৃতির এক প্রাচীন প্রজাতির বর্ণনা দিয়ে। বিজ্ঞান যাদেরকে নিয়ান্ডারথাল মানুষ হিসেবে পরিচয় দেয়। বিজ্ঞানের ভাষায় তারাও একপ্রকার মানুষ। তবে আধুনিক মানুষের অভ্যাস ও চরিত্রের সাথে তাদের রয়েছে অনেক অমিল! ইসলাম ধর্মে মানুষের ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা এবং মানুষ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বিস্তারিত ধারণা রয়েছে। বিজ্ঞানের অমিল ও ইসলাম ধর্মের দাবিগুলোর তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ দেখা যায়, নিয়ান্ডারথালের দেহখানি মানুষের মতো হলেও তারা প্রকৃতই কোনো মানুষ ছিল না। মানুষের মতো দেখতে কিছু প্রাণীকে মানুষ বলার জন্যও সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়, যা নিয়ান্ডারথালের মধ্যে ছিল না।

পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রাণীদের মধ্যে মানুষই হলো একমাত্র ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। স্বভাবে, চরিত্রে, অবয়বে, গঠনে ও জীবনচরিতে মানুষের সাথে উদাহরণ দেওয়া যায় এমন আরেকটি সৃষ্ট প্রাণী পৃথিবীতে নেই। দৃশ্যত পৃথিবীতে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে বসবাস করে চলছে। আমরা এমনটি দেখতে পাই। কিন্তু বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে মানুষের জীবন দুনিয়ার পরিবেশ ও জলবায়ুর উপযোগী নয়। মানুষকে পদে পদে বিপত্তির মুখোমুখি হয়ে চলতে হয় প্রতিনিয়ত। মানুষ নিজের অজান্তে এসব মানিয়ে চলে বলেই বিষয়টি নজরে আসে না।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি রোগ-শোক মোকাবিলা করতে হয় একমাত্র মানুষকেই! এমনটি অন্য কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। অন্য প্রাণীর চেয়ে মানুষের রোগব্যাধি বেশি। এই কারণে উদ্ভূত রোগব্যাধি দূর করতে মানুষের জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়। এর ফলে মানুষের মধ্য থেকেই ডাক্তার হতে হয় কাউকে কাউকে।

আবার ভূপৃষ্ঠে প্রাণীদের জন্য নিরাপদ কোথাও একটু জায়গা হলেই ঘুমের জন্য যথেষ্ট। ওটাই প্রাণীদের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু মানুষের বসবাসের জন্য এক কক্ষের ঘর হলেই চলে না। কেননা, মানুষের জন্য এক কক্ষের ঘর, শুধু বাঁচার প্রয়োজন নয়! একটি আলাদা কক্ষ মানুষের চিত্তবিনোদনেরও একটি বড়ো মাধ্যম। মানুষের জন্য বহু ঘরের দরকার; ঘরের ওপরে ঘর তুলে হলেও সমস্যা লাঘব করা লাগে। সেজন্য মানুষের মধ্য থেকেই কেউ স্থপতি হয়, কাউকে প্রকৌশলী হতে হয়; তাদের হাত ধরেই সৃষ্টি হয় দৃষ্টিনন্দন ঘরবাড়ি ও নান্দনিক স্থাপনা।

এক সূর্যের আলোতে একই আকাশের নিচে পৃথিবীর সকল মানুষ ও প্রাণীদের বসবাস। গভীরভাবে তাকালেই দেখা যায়, এখানেও মানুষের জীবনধারা এক ধরনের আর অন্য প্রাণীদের জীবন হয়েছে ভিন্ন। এর পেছনের অন্তর্নিহিত ঘটনাগুলোই বিজ্ঞানীদের তাজ্জব ও চিন্তার ঘোরে আবদ্ধ করেছে। পৃথিবীর বুকে চলমান প্রাণী ও মানুষের জীবনের ওপরে বর্ণিত তফাত হাতে গোনা কয়েকটি নয়; বরং অসংখ্য ও অগণিত! মানুষ ও

প্রাণী জীবনের উপাত্ত থেকে সৃষ্ট, বহু প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানের কাছে নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, বিজ্ঞানের এমন অমীমাংসিত উত্তর পবিত্র কুরআনে আছে। সেসবের উল্লেখযোগ্য কিছু উপস্থাপন করাই এই বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—'মানুষকে পৃথিবীর মাটি দিয়ে বানানো হয়েছে। তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে জান্নাতে। সেখানে মানুষের বন্ধুত্ব ফেরেশতারা গ্রহণ করেছে। মানুষ অভিশপ্ত জিন শয়তানের দেখা পেয়েছে এবং তাদের কর্তৃক প্রতারিত হয়েছে।' এসব কথা দৃশ্যত বিজ্ঞানের সূত্রমতে ধোপে টিকে না। কিন্তু আমরা যখন এই বইয়ে মানুষের স্বভাব-চরিত্র নিয়ে অধ্যয়ন করব, তখন দেখতে পাব—ওপরে বর্ণিত কুরআনের সকল কথাই হুবহু সঠিক ও বাস্তবানুগ। মানুষ উচ্চমার্গের সৃষ্টির স্বভাব পেয়েই উন্নত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষের স্বভাব-চরিত্র সৃষ্টিতে অপরাগ। চেষ্টা করলেও পৃথিবীর প্রাণীরা মানুষের মতো অতি উচ্চমার্গের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারবে না। বানর-হনুমানের মতো দৃশ্যত কাছাকাছি অঙ্গ বৈশিষ্ট্যের প্রাণীর সাথেও মানুষের তফাত তুলনীয় নয়। এই বইয়ে মানুষের স্বভাব ও চরিত্র অধ্যায়ে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা লেখাপড়ায় অনাগ্রহী ব্যক্তিকেও চরম আগ্রহী করে তুলবে এবং তাকে কুরআন নিয়ে ভাবনার জগতে হাজির করবে।

কুরআন বলেছে—'মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধু আল্লাহর দাসত্বের জন্যই।' স্বভাবতই একটি কথা এসে যায়, তাহলে

পৃথিবীতে বিচরণশীল অন্য প্রাণীরা কি এই গুণাবলি ও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। এই কথাটিও বোঝার জন্য আমাদেরকে পৃথিবীর অন্য প্রাণীদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে জানতে হবে। এই বইয়ের শেষ দিকে তারই আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে আশ্চর্য হয়ে দেখতে পাব, মানুষের গঠন ও অবয়বে যদি সামান্য পরিবর্তন সূচিত হতো, তাহলে মানুষের পক্ষে আল্লাহর যথাযথ দাসত্ব করা সম্ভব হতো না। দাসত্ব তথা ইবাদত মানুষের বর্তমান দেহকাঠামো দিয়েই সম্ভব। বানর-হনুমানের শরীরে মানুষের চেয়ে ব্যতিক্রমী চৌকশ কারিগরি দক্ষতা থাকার পরও তারা মানুষের মতো করে ইবাদত করতে পারবে না। পাঠকেরা এই বিষয়টি পাঠ করার পরই জানতে পারবে, মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করা কতটা ভাগ্যের, আর আল্লাহর ইবাদত না করাটা কতটা দুর্ভাগ্যের।

সৃষ্টিজগতে একমাত্র মানুষের কাছেই রয়েছে চিবুক; যা আর কোনো প্রাণীর কাছে নেই! বিষয়টি সাধারণ মনে হলেও আমরা এই বইয়ে দেখতে পাব, চিবুকের কল্যাণেই মানুষ কথা বলতে পারছে। সুর সৃষ্টি করতে পারে, গাইতে পারে, কণ্ঠে কম্পন সৃষ্টি করতে পারে। অন্যদের এটি নেই বলেই তারা কথা বলতে পারে না। মানুষের বৈসাদৃশ্যের এটি একটি নমুনা।

সৃষ্টিজগতের সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর লিঙ্গে হাড় থাকে, কিন্তু মানুষই একমাত্র সৃষ্টি, যাদের লিঙ্গে প্রাণীদের মতো হাড় নেই! এমন একটি নীরস বিষয়ও এই বইয়ের মধ্যে সরেস হিসেবে হাজির হয়েছে। এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষ সম্পর্কিত বহু

কৌতূহলী ধারণা। লিঙ্গের এই ছোট্ট ব্যতিক্রমের মাধ্যমেই মানুষ বেশি সন্তানের জন্ম দিতে পারছে। যখন ইচ্ছে তাদের যৌন আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করতে পারে। এটার কারণেই যৌনতা মানবজীবনের একটি বিরাট অংশ হয়ে গেছে। এই একটিমাত্র ব্যতিক্রমেই আমরা বুঝতে পারব, মানুষ দুনিয়ার সৃষ্ট কোনো জীব নয়। তাকে অন্য কোথাও সৃষ্টি করে পরে কোনো একসময়ে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে।

DNA ও মানুষ সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আছে। তাকদির ইসলামে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু DNA-এর কার্যক্রম পড়ার পরে তাকদিরের মতো সংবেদনশীল বিষয়টিকেও যৌক্তিক বলে মনে হবে। ইসলাম ধর্মের দাবি সবকিছু তাকদির অনুসারে চলে। আমরা দেখতে পাব, DNA-এর কার্যক্রমও অনেকটা তাকদিরের ফয়সালার মতোই চলে। একে কেউ যেন অগ্রিম নির্দেশনা দিয়ে রাখে, সে অনুপাতেই DNA সৃষ্টিকর্ম সাজায়। আমরা এই বইতে দেখতে পাব, তাকদির ব্যতীত সৃষ্টিকর্ম চলাটাও দুষ্কর! বিষয়টি নতুনভাবে এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রাণ ও প্রাণের ধারণা সম্পর্কিত একটি বিষয় যুক্ত হয়েছে, যা ইসলাম ও বিজ্ঞানের দাবিকে একসূত্রে গেঁথে ফেলেছে।

মানুষের মেরুদণ্ডের বৈশিষ্ট্যের সাথে অন্য কোনো প্রাণীর মেরুদণ্ডের মিল নেই। অন্য প্রাণীদের মেরুদণ্ড কঠোর পরিশ্রমের উপযোগী এবং বার্ধক্য অবধি অবিরত শ্রম দিতে পারে। আর মানুষের মেরুদণ্ড কঠোর পরিশ্রমের উপযোগী নয়;

বরং মানুষ নিয়মিত কোমর ও মেরুদণ্ডের ব্যথা-বেদনায় কষ্ট পায়। এই ব্যথার কারণে পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বেশি কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়। অচিরেই কাজ ছেড়ে দিতে হয়। মার্কিন বিজ্ঞানী ড. এরিস সিলভার বলেছেন, মানুষের মেরুদণ্ড কঠোর শ্রমের উপযোগী তো নয়ই; বরং এমন মেরুদণ্ড শুয়ে-বসে, আরাম-আয়েশ করার উপযুক্ত। পবিত্র কুরআনে বলা আছে, মানুষের মূল বাসস্থান জান্নাতে। জান্নাত হলো অনন্তকালের সুখের আবাস। মানুষ সেখানে শুয়ে-বসে খাবে, অবারিত পান করবে। মানুষ শুরুতে জান্নাতে ছিল এবং তার মূল গন্তব্যস্থল হলো জান্নাত। সুতরাং বোঝা গেল, মানুষের মেরুদণ্ডখানি জান্নাতের সুখ উপভোগ করার মতো কায়দা করেই বানানো হয়েছে; যার কারণে ওটা দিয়ে কাজ করা পৃথিবীর জীবনে কিছুটা কষ্টকর হয়। ফলে সংগত কারণেই প্রমাণিত হয়, মানুষ : পৃথিবীর অনুপযোগী এক প্রাণী এবং এটাই এই বইয়ের শিরোনাম করা হয়েছে, তা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত ও মানানসই!

ব্যক্তি হিসেবে আমি একজন লেখক, ব্লগার ও প্রবাসী। ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডেই আমার কাজ। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রকৃতি ও ইতিহাস আমার পছন্দের শীর্ষে অবস্থান করা বিষয়। লেখালিখি আমার পেশা নয়; বরং বলা চলে এক বিরাট নেশা। কেউ একজন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেওয়ার অর্থ এই নয়, তিনি সে বিষয়টি খুব পছন্দ করেন কিংবা বেজায় পারদর্শী। বর্তমান দুনিয়ায় পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়তে পারাটাও বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। সে কারণে বাংলা

সাহিত্য নিয়ে পড়া ছাত্রদের সবাই সাহিত্যিক হয়ে ওঠে না; প্রাণ রসায়নে পড়া সকল ছাত্রই গবেষক হয় না এবং দর্শনে পড়া ব্যক্তিরাও দার্শনিক বনে যান না। আমার ক্ষেত্রেও হয়তো তা-ই হয়েছে। আমার জানার অদম্য আগ্রহ, প্রবল কৌতূহল এবং সদা ভাবনাচিন্তার অনুপ্রেরণা আমাকে দুঃসাহসী করে তুলেছে এমন একটি বই লেখার পেছনে সময় দিতে।

আমি যেভাবে বিজ্ঞানের একজন নিবেদিতপ্রাণ একজন ছাত্র। সেভাবে পবিত্র কুরআন-হাদিসের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী পাঠক। আমার জানার আগ্রহ ও কৌতূহল থেকে এই দুটি বিষয় কোনো দিন বাদ যায়নি। যার কারণে বিজ্ঞান পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে, এই প্রশ্নটির উত্তর যেন পবিত্র কুরআনেই আছে! আবার পবিত্র কুরআনের কোনো ঘোষণার অন্তর্নিহিত বিষয় অনুধাবন করতে গিয়ে মনে হয়েছে, এই কথার সাথে বিজ্ঞানের ওই বিষয়টির কোথাও যেন মিল দেখা যাচ্ছে। এমন ঘটনায় পিছপা না হয়ে, ঝোঁকের মতো বিষয়টির পেছনে লেগে থাকতে গিয়ে, যেখানেই তথ্য-উপাত্ত পেয়েছি সেটা নিয়ে পড়েছি। বিস্তারিত নোট রেখেছি। সেগুলো থেকে বাছাই করা বিষয়গুলো দিয়েই *মানুষ : পৃথিবীর অনুপযোগী এক প্রাণী* নামক বইটি সাজানো হয়েছে। এর কারণে পাঠক কোথাও বই, কোথাও কুরআন-হাদিস এবং কোথাও জার্নালগুলোর ওয়েব লিংক দেখতে পাবেন। ডিজিটাল জামানায় পাবলিকেশনের ধারণা এখন বহু পালটে গেছে। এখন সবই ছাপা হয় না, বহু আর্টিকেল ওয়েব সাইটেই প্রকাশিত হয় এবং ভবিষ্যতে এই প্রবণতা আরও বাড়বে। ফলে আমাকেও লিংক দিয়ে রেফারেন্স দিতে হয়েছে।

পরিশেষে আমি একজন মানুষ, যার ভুল হয়। কেউ ভুলে ঊর্ধ্বে নয়। পুরো গ্রন্থেই বিবেচনা ও বিশ্লেষণ বিরাট গুরুত্ব পেয়েছে, আমাকে এর ওপরেই দাঁড়াতে হয়েছে। এই গ্রন্থে বিজ্ঞান ও ইসলাম পাশাপাশি উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বত্র সঠিক তথ্য দিতে আমি সর্বোচ্চ পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করেছি। তারপরও স্বীয় দুর্বলতাকে জয় করতে পারিনি। আমার এই মানবিক দুর্বলতার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। তিনি যেন আমাকে তাঁর দয়া ও রহম দ্বারা সদা আবৃত রাখেন।

মানুষ : পৃথিবীর অনুপযোগী এক প্রাণী

মানুষকে বানানো হয়েছে এমন স্থানে রাখার জন্য, যেখানে পৃথিবীর উপযোগী পরিবেশ অনুপস্থিত। ফলে পৃথিবী নামক এই ট্রানজিট পয়েন্টে মানুষকে প্রতিনিয়ত প্রকৃতি ও নিজের বৈশিষ্ট্যের বিপরীত পরিবেশে লড়াই করে বাঁচতে হয়। সেই হিসেবে বইয়ের নামকরণ *মানুষ : পৃথিবীর অনুপযোগী এক প্রাণী* যথার্থ, প্রমাণিত ও গ্রহণযোগ্য।

উড্ডয়ন ও অবতরণ বলে বিমানের দুটো গন্তব্যস্থল থাকে। বিমানের দীর্ঘযাত্রায় পথমধ্যে কখনো দুবাই, সিঙ্গাপুর, হিথ্রো এয়ারপোর্টে সাময়িক সময়ের জন্য ট্রানজিটের নামে অবস্থান করতে হয়। ট্রানজিটের সময়গুলো সুখকর ও চিন্তামুক্ত হয় না। তবে এই সময়ে ঘড়ির কাঁটা মেপে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এয়ারপোর্টে রক্ষিত দোকান থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতে হয়। মানুষের জীবনেও পৃথিবীর এই জীবনটা হলো

অবিকল ট্রানজিট পয়েন্টের মতো। এখানে সময় ও সুযোগ নষ্ট করা মানেই সেই সুযোগ হারিয়ে ফেলা, যা আর কোনো দিন পাওয়া যাবে না।

উপসংহারে বলা যায়, একজন সতর্ক, সচেতন, বিবেক, বুদ্ধিমান মানুষ এই বইয়ের বিস্তারিত তথ্য-উপাত্তে অবশ্যই প্রভাবিত হওয়া উচিত। মানুষের সৃষ্টি যেমন সাধারণ বিষয় নয়, প্রতিটি ব্যক্তির জীবনীও তেমনই অসাধারণ কিছু। তাই মানুষ যেন গাফিল না হয় এবং আল্লাহর দৃষ্টান্তকে যেন অবজ্ঞা, অবহেলা না করে, এটাই মানুষ সৃষ্টির অন্যতম লক্ষ্য। এটাই বোঝাতে দুনিয়াতে বহু নবি-রাসূল এসেছেন। পাঠানো হয়েছে বহু আসমানি কিতাব।

যাকে শ্রেষ্ঠতম উপাদান উপহার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ওটা নিয়ে সে ভাবে না। তার চোখের সামনে দৃশ্যমান হাজারো নিদর্শন দেখেও তার বোধোদয় হয় না যে, কাউকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে না। প্রতিটি ভালো-উত্তম কাজের মূল্যায়ন যেমন থাকতে পারে, প্রতিটি মন্দ-অসৎকাজেরও তেমন প্রতিদান থাকতে পারে। এমন একটি পাল্লার মানদণ্ডে যদি বিচার্যই না হতো, তাহলে মানুষের জন্মও পৃথিবীতে সৃষ্ট অন্য দশটা অভদ্র-ইতর প্রাণীর মতোই হতো। মানুষের মাঝে আর তাদের মাঝে এত তফাত থাকার দরকার পড়ত না।

আর যারা বিবেক-বিবেচনাবোধকে কাজে লাগায়, সত্য-মিথ্যার তফাত করে, দূরদৃষ্টি দিয়ে চিন্তাভাবনা করে, আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী হয়ে যাবেন—এমন তথ্য-উপাত্ত আমরা কুরআন-

হাদিস থেকেই পেয়েছি। এরাই হবেন আল্লাহর উপযুক্ত বান্দা। পৃথিবীর কর্মকাণ্ডকে তাদেরই অনুগত করে দেওয়া হয়। তারা দুনিয়াতে যেমন ব্যুৎপত্তি অর্জন করে, আখিরাতেও তারা সফল। এদের হাতেই সভ্যতা বিকশিত হয়। তাদের দ্বারাই শোভা পায় মহান আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ দাসত্ব। আল্লাহর প্রতি আন্তরিক এবং তাঁর আদেশের দিকে খুশিমনে দৌড়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্বয়ং আল্লাহ পরিচয় করে দিয়েছেন 'ইবাদুর রহমান' হিসেবে।

ইবাদুর রহমান অর্থ পরম করুণাময়ের একান্ত নিবেদিত দাস! তার হাতেই আল্লাহর যথাযথ দাসত্ব কার্যকরী হয়। পবিত্র কুরআনে তাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে—

> 'রহমানের (আসল) বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলতে থাকলে বলে দেয়, তোমাদের সালাম। তারা নিজেদের রবের সামনে সিজদায় অবনত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেয়! তারা দুআ করতে থাকে—"হে আমাদের রব! জাহান্নামের আজাব থেকে আমাদের বাঁচাও, তার আজাব তো সর্বনাশা! আর আশ্রয়স্থল ও আবাস হিসেবে তা বড়োই নিকৃষ্ট জায়গা!" তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং উভয় প্রান্তিকের মাঝামাঝি তাদের ব্যয় ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে...।' সূরা ফুরকান : ৬৩-৬৭

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পরিক্রমা ১৯

মানুষ যেভাবে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করল ২৩

নিয়ান্ডারথালের পরিচয় ২৫

নবিগণই বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার মহানায়ক ২৮

মানুষের প্রতি ভাষাজ্ঞানের নিয়ামত ৩০

উচ্চারণের তারতম্য মানবসমাজে বিরাট প্রভাব ফেলে ৩২

কথার সাহায্যে মানুষকে সম্মানিত করার রহস্য ৩৩

মানুষকে এমন যোগ্যতা দেওয়ার রহস্য ৩৫

দুনিয়ায় প্রতিনিধিত্বের ধারণা ৩৭

প্রতিনিধির কার্যাবলি ৩৮

পৃথিবীর প্রতিনিধি যেভাবে ব্যবস্থাপনার বিপর্যয় ঘটায় ৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৃষ্টিজগতে মানুষই একমাত্র ব্যতিক্রম ৪৫

কেবল মানুষেরই চিবুক আছে ৪৫

মানুষ ও প্রাণিকুলের চিবুকের গঠন ৪৬

মানুষের চিবুকের অবিস্মরণীয় ম্যাকানিজম ৪৭

এত ব্যতিক্রমের মূল হোতা চিবুকের কাজটাই-বা কী ৪৯

মানুষ ও প্রাণীর যৌনতা এবং অঙ্গ কাঠামোর বৈপরীত্য ৫২

বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে প্রাণীদের লিঙ্গে হাড়ের প্রয়োজনীয়তা ৫৪

ধর্মীয় জীবনে যৌনতা ও দর্শন ৫৭
বিজ্ঞান ও ইসলামের দৃষ্টিতে ভদ্রতা ও যৌনতা ৫৮
মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে যৌনতার ভিন্নতা ৬০
মানুষ ও প্রাণীর যৌন স্বভাবের অন্তর্নিহিত রহস্য ৬২
হাড়বিহীন মানবলিঙ্গের গঠন-প্রকৃতি ৬৪
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পোশাকের জন্ম ৬৬
প্রাণীদের পোশাক ছাড়া চলে, মানুষ কেন পারে না ৬৭
পোশাকের নৈতিকতা ও বৈষয়িকতা ৬৯
দুনিয়াতে আসার পূর্বে জান্নাতে মানুষ পোশাক পরত ৭১
জান্নাতের আলোর পোশাকের একটি হাইপোথিসিস ৭৩

তৃতীয় অধ্যায়
মানুষ পৃথিবীর সৃষ্ট নয় ৭৬

মানুষ নিয়ে Dr. Ellis Silver-এর ধারণা ৭৮
মানুষের জীবনে ব্যথা-বেদনার প্রকোপ ৭৮
মেরুদণ্ডে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব কার্যকর ৮০
পৃথিবীর পরিবেশ মানুষের উপযোগী নয় ৮১
মানুষ দুর্বল বলেই বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ৮৪
মানুষের মেরুদণ্ড আরাম-আয়েশের উপযোগী ৮৬
পিঁড়ি থেকে পালঙ্ক : আরামপ্রিয়তা মানবজাতিকে রেখেছে কর্মক্ষম ও ব্যস্ত ৮৭
গিরগিটির গলা ফোলানো এবং ভিটামিন ডি-এর রহস্যময়তা ৯০

অকালে চুল পাকা, বুড়িয়ে যাওয়া এবং কিচ্ছুটি ভালো না লাগা ৯২
মানুষের খাদ্যপ্রণালিই বলে দেয়, তারা পৃথিবীর আবর্তনে সৃষ্ট প্রাণী নয় ৯৪
তৃণভোজী প্রাণীর খাদ্যের ধরন ৯৫
পাখিদের খাদ্যপ্রণালি ৯৫
প্রাণীদের খাদ্যপ্রণালি ৯৫
মানুষ নিজের খাদ্য চেনে না ৯৬
মূলত মানুষের খাদ্য কী ৯৬
মানুষের প্রসববেদেনা সৃষ্টির অন্যদের চেয়ে বহুগুণ বেশি ৯৭
সন্তান জন্মদানে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ৯৮
জান্নাতে মানবীদের আকার কেমন ছিল : একটি হাইফোথিসিস ৯৯

চতুর্থ অধ্যায়

সৃষ্টি ভিনজগতে কিন্তু বনেছে মাটিতে ১০০
আদম (আ.) সৃষ্টির সূচনা ১০১
যে মাটি দিয়ে আমাদের হাড়-মাংসের সৃষ্টি ১০২
মানবদেহ সৃষ্টির পর্যায়ক্রম ১০৪
ইবলিস যেভাবে মানুষের ওপর প্রবল ক্ষমতার অধিকারী ১০৫
জান্নাতের সামনে আদমের নিষ্প্রাণ দেহ ও দাম্ভিক ইবলিস ১০৮
দাম্ভিকতাই ইবলিসকে শয়তানে রূপান্তর করে ১০৯

ইবলিসের দুআ কবুল ১১১
মানুষকে সারাজীবন শয়তানের দুশমন বিবেচনা ১১১
শয়তানের দায়িত্বে মানুষের জীবন ১১২
মানুষের ওপর ইবলিস যেভাবে ক্ষমতা দেখায় ১১৪
মানবসভ্যতার বিকাশে ফেরেশতাদের ভূমিকা ১১৪
নবি-রাসূলগণের সাথে ফেরেশতাদের দেখা ও কথা ১১৬

পঞ্চম অধ্যায়

মানবদেহের অন্তহীন আণুবীক্ষণিক বিস্ময় ১১৮

DNA ১১৯
একজন মানুষের DNA তথ্য লিখতে ২৩ লক্ষ কপি কাগজের দরকার ১২০
DNA জীবনের ব্লুপ্রিন্ট বা নীলনকশা ১২১
DNA-এর কাজের প্রকৃতি ১২১
'হও' বললেই সৃষ্টির সূচনা হয় : বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রতিষ্ঠিত ১২৩
মানবদেহে DNA কোডের ভূমিকা ১২৪
DNA মানুষ বানানোর অন্যতম কারিগর ১২৬
DNA-এর কারিগরি দক্ষতা প্রবল ১২৭
DNA কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মূল কারিগর ১২৭
সৃষ্টির তাকদির না থাকলে সৃষ্টিকর্মে বিপর্যয় ১২৯
তাকদির না থাকলে সৃষ্টিকর্মে যে ব্যাঘাত ঘটত ১৩১
মহাক্ষমতাবানের কার্যপ্রণালি ১৩১
যে তথ্য লিখতে গেলে সমুদ্রের পানিও নিঃশেষ হয়ে যাবে ১৩৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাণ রহস্য **১৩৭**

রুহের অস্তিত্ব ও তার পরিচয় ১৩৭

রুহের পরিচয় ১৩৭

রুহের জগৎ থেকে দুনিয়া : সকল বিড়ম্বনার মূল অনুঘটক ১৪০

আলমে আরওয়া তথা রুহের জগৎ ১৪১

আলমে দুনিয়া তথা ক্ষণস্থায়ী জগৎ ১৪৩

মহাপ্রলয়ের শিঙায় সবই ধ্বংস হবে, রক্ষা করা হবে মানুষের প্রাণ ১৪৪

আলমে বারজাখ তথা অন্তরায়পূর্ণ জগৎ ১৪৫

আলমে আখিরাত তথা সর্বশেষ জগৎ ১৪৭

সপ্তম অধ্যায়

মানবস্বভাব **১৪৮**

মানবস্বভাব অনেকটা স্থায়ী ১৪৮

মানুষের স্বভাবধর্ম ১৪৯

স্বভাব থেকে শখ, সৌখিনতা, সদ্ভাব ও সখ্যতার সৃষ্টি হয় ১৫১

স্বভাবের ওপর শখের প্রভাব অচিন্তনীয় ১৫২

কুরআনে উল্লিখিত মানুষের স্থায়ী স্বভাব ১৫৪

ক. মানুষ তর্কপ্রবণ ১৫৪

খ. মানুষ ঝগড়াটে প্রকৃতির ১৫৬

গ. মানুষ তাড়াহুড়াপ্রবণ ১৫৮

ঘ. মানুষ বৈশিষ্ট্যগতভাবে উদাসীন ১৫৯
ঙ. সীমালঙ্ঘন : যা মানুষের অন্যতম প্রিয় স্বভাব ১৬১

অষ্টম অধ্যায়

মানবচরিত্র ১৬৫

চরিত্রের কারণেই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব ১৬৫
চরিত্রের ভালো ও মন্দ দিক : মাপার মানদণ্ডের নাম চরিত্র ১৬৭
চরিত্রের ওপর আবেগের প্রভাব ১৬৯
মানবচরিত্র : রোমান্টিকতার প্রবল প্রভাব ১৭২
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মানুষের চরিত্র ১৭৪
যে কৌতূহল মানুষকে দিশেহারা করে ১৮৭
স্বভাব ও চরিত্র ১৮৯

নবম অধ্যায়

মানুষ হিসেবে নিজেকে চেনা ১৯২

সভ্যতা বিনির্মাণে মানুষের হাত দুটির বিস্ময়কর অবদান ১৯২
চোখ : কৃতজ্ঞ মানুষের দুনিয়া উপভোগের মাধ্যম ১৯৫
কান : ফিসফিস শব্দ শোনে এবং চোখের চেয়েও মূল্যবান ১৯৭
বিজ্ঞানের স্বীকারোক্তি : দোষ করার পেছনে কপালের ভূমিকা ২০১
হৃৎপিণ্ড : জীবনের চালিকাশক্তি ২০৩
জিহ্বা : নিয়ামত ভোগের অন্যতম মাধ্যম ২০৫
Brain : ব্রেন নিয়ে মগজ খাটাই ২০৭
মগজের ক্ষমতা ২০৮
মগজের কাজের ধরন ২০৯

ধৈর্য ও অধ্যবসায় মগজের জ্বালানি	২১০
মানুষ সৃষ্টির মূল কারণ	২১২
মানসিক দাসত্ব	২১৪
এক. নিয়ামতের প্রশংসা	২১৪
দুই. জ্ঞানের উপলব্ধি	২১৬
তিন. শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা	২১৯
চার. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না	২২০
শারীরিক দাসত্ব	২২৩
এক. স্থির ও দণ্ডায়মানতার দাসত্ব	২২৪
দুই. রুকুর মাধ্যমে আত্মসমর্পণ	২২৫
তিন. সিজদায় অবনত হওয়া	২২৭
চার. রোজার মাধ্যমে উপোস থাকা	২২৯
দাসত্ব পালনকারীর প্রকৃত পরিচয়	২৩১

প্রথম অধ্যায়

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পরিক্রমা

দুই পা, দুই হাত, লাঠির মতো খাড়া, শেষ প্রান্তে ফুটবলের বলের মতো গোলাকার মাথাবিশিষ্ট অদ্ভুত এই প্রাণীটির পরিচয়—'মানুষ!' বহুদূর পর্যন্ত এ ধরনের অবয়বের ছায়ামূর্তি ধেয়ে গেলে তাকে মানুষ বলা হয়! কেননা, দুনিয়াতে এমন অবয়ব একমাত্র মানুষ ছাড়া আর কারও কাছেই নেই। এর বিপরীতে চার পাবিশিষ্ট কিছু ধেয়ে গেলে শতভাগ নিশ্চিত না হওয়া অবধি বলা যায় না, সেটা আসলে কোন প্রাণীর অবয়ব! বাহ্যিকভাবে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে দৃশ্যমান তফাত এটিই।

সাধারণত এভাবেই মানুষ ও প্রাণীর পরিচয় আলাদা করা হয়। তবে আমরা বিষয়টির যতই গভীরে যেতে থাকব, দেখতে পাব—মানুষের সঙ্গে সৃষ্টিজগতের অন্য প্রাণীর সাথে রয়েছে বিরাট বৈসাদৃশ্য। শুধু তা-ই নয়, বাহ্যত দেখতে অবিকল মানুষের মতো দেহ ও চলাফেরায় একই সাদৃশ্যযুক্ত প্রাণী একসময় পৃথিবীতে ছিল! এত মিল থাকার পরও তারা কিন্তু মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি! তাহলে তো প্রশ্ন এসেই হয়ে যায়—তাদের সাথে কী এমন তফাত সৃষ্টি হলো, যদ্দ্বারা মানুষকে আলাদা করা হয়!

কলিজার তৃষ্ণা মেটে না, যতক্ষণ না পানি পান করা হয়। একইভাবে মানুষের মনের তৃষ্ণাও মেটে না, যতক্ষণ না তারা একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে পারে। আমরা কথা বলে ঝগড়া করি, কথার দ্বারাই যুদ্ধ বাঁধাই, বাহ্যিকভাবে কিছু করার ক্ষমতা না থাকলে কথার বাণে অন্যকে ঘায়েল করি। ফলে কথা বলতে পারার সৌভাগ্যটা আর তা মানুষের প্রতি কেমনতর দান, সেটা উপলব্ধি করতে পারি না।

মূলত, কথা বলতে পারাটাই হলো মানুষের সৃষ্টি, সমৃদ্ধি ও গৌরবের অন্যতম কারণ। বাস্তব দুনিয়াতেও এক মানুষের সাথে অন্য মানুষের মধ্যে বৈশিষ্ট্যসূচক তফাত নির্ধারিত হয় কথা দ্বারাই; যার আরেক নাম—বাক্শক্তি। পৃথিবীর সকল প্রাণী আর মানুষের সাথে শ্রেষ্ঠতম ব্যতিক্রমটিও এখানে!

মানুষ সামাজিক জীব। পৃথিবীতে বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে। তা আসলে একমাত্র কথা বলার যোগ্যতার কারণেই! আর অন্যান্য প্রাণীরা এখনও ইতর-অসামাজিক জীব হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, একমাত্র তাদের কথা বলার যোগ্যতা বা বাক্শক্তি না থাকার কারণে!

মানুষের অঙ্গের সাথে কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে, এমন প্রাণীদের কথা বলার যোগ্যতা সম্পর্কে যাচাই করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন ভিন্নমাত্রার তথ্য! বানর, হনুমান, শিম্পাঞ্জি গোত্রের প্রাণীদের অঙ্গ কিছুটা মানুষের মতো। তবে তারা মানুষের মতো কথা বলতে পারে না। তারা নিজেদের মতো করে একধরনের সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করেই কাজ চালায়।

একে অপরের ভাববিনিময় এবং তথ্যের আদান-প্রদান এই সংকেতের মাধ্যমেই করে থাকে।

প্রাণীভেদে সংকেতের তারতম্য ঘটলেও সবারই একটি নিজস্ব ভাষা আছে। তবে সে ভাষাটি মানুষের মতো ব্যাখ্যামূলক নয়। *Sapiens : A brief History of Humankind* গ্রন্থে বিজ্ঞানী Yuval Noah Harari উল্লেখ করেছেন—

জীববিজ্ঞানীরা দলবদ্ধ সবুজ বানরের শব্দ প্রয়োগ বা ভাষার অর্থ বের করেছে। যেমন : 'হুঁশিয়ার ইগল!', 'হুঁশিয়ার সিংহ!' বিজ্ঞানীরা এই শব্দগুলো রেকর্ড করে একদল বানরের অজ্ঞাতে তাদের লক্ষ্য করে বাজিয়েছেন। 'হুঁশিয়ার ইগল' শব্দটি শুনলেই তারা আকাশপানে তাকায়। আবার 'হুঁশিয়ার সিংহ' শোনামাত্রই ভয়ে-আতঙ্কে গাছে লাফিয়ে ওঠে।[১]

এর দ্বারা বোঝা গেল, তারা পরিবেশ ও ক্ষেত্রবিশেষে সুনির্দিষ্ট সংকেত ব্যবহার করে। ফলে যখন টেপরেকর্ডারের শব্দ শুনেছে, তখন তারা শব্দের বিশ্লেষণ করার সুযোগ ব্যতিরেকেই পালানোর জন্য চিন্তা করেছে। এভাবে ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকল প্রাণীই এমন পদ্ধতি অনুসরণ করে। একটি ছোট্ট শব্দের উচ্চারণ থেকেই তারা পরিস্থিতির ধারণা পায়।

আমরা জানি, অর্থবোধক শব্দের সমষ্টিই বাক্যের সৃষ্টি করে। প্রাণীরা শব্দ সমষ্টির মাধ্যমে বাক্য সৃষ্টি করতে পারে না। তারা শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমেই ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়, আর এভাবেই আবর্তিত হয় তাদের জীবন।

---

[১] *Sapiens : A brief History of Humankind*, Page : 21

মানুষ বাক্য সৃষ্টি করতে পারে শব্দের মাধ্যমে। ফলে তারা ঘটনাকে বিস্তারিত বর্ণনা করতে পারে। কেননা, প্রাণীদের মতো এমন পরিস্থিতিতে মানুষ মুখোমুখি হলে তারা বিষয়টিকে এভাবে বলবে—'সবাই হুঁশিয়ার! গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে, নদীর বাঁকে, কদমগাছের নিচে, একটি সিংহ লুকিয়ে আছে।'

মানুষ এমন বিস্তারিত ও লম্বা লম্বা কথা অনুধাবন করতে পারে। এমন কথা শোনামাত্রই, তাদের মনোজগতে চিন্তার ঝড় শুরু হয়। আর ভাবনাচিন্তার মধ্য দিয়ে এর করণীয় ঠিক করতে পারে। ফলে প্রতীয়মান হয়, মানুষ শুধু কথাই বলতে পারে না; কথার গভীরে যাওয়ার জন্য তথ্য বিশ্লেষণও করতে পারে!

প্রাচীনকাল থেকেই আঁকাআঁকি, খোদাই করার মাধ্যমে, সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে মানুষ নিজেদের কথাগুলোকে রেখে যেতে চেষ্টা করেছে, যেন পরবর্তী সময়ে কেউ এগুলো বিশ্লেষণ করে এর মর্ম উদ্ধার করতে পারে। তাই কথা ও ভাষা বিশ্লেষণ এবং লেখা সংরক্ষণের কাজে পারদর্শী বলেই মানুষ পৃথিবীতে সৃষ্টিশীল। তার কাছে রয়েছে নান্দনিক উদ্ভাবনী ক্ষমতা! এর মূলে রয়েছে বাক্যের ব্যবহার।

এই যে ভাষার কারণে মানুষের এত শ্রেষ্ঠত্ব, এত গুরুত্ব, সেই ভাষা কীভাবে মানুষ আয়ত্ত করল—এর প্রমাণ বিজ্ঞানীদের কাছে না থাকলেও তারা ব্যাখ্যা দিয়েছেন থিওরির মাধ্যমে! যেমন : Accidental Genetic Mutations Change তথা দুর্ঘটনাজনিত জেনেটিক পরিবর্তন!

হ্যাঁ, মানুষ কীভাবে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করেছে, বিজ্ঞানীদের কাছে এর স্বপক্ষে বিস্তারিত তথ্য না থাকলেও ইসলাম দাবি করে এই প্রশ্নের উত্তর তার কাছে রয়েছে। সামনের আলোচনায় বিস্তারিত দেখতে পাব—মানুষ কীভাবে, কার মাধ্যমে এই অবিস্মরণীয় যোগ্যতা অর্জন করেছে।

১৮৫৬ সালে জার্মানির নিয়ান্ডারথাল নামক এক উপত্যকায় অবিকল মানুষের হাড়ের মতো কিছু ফসিল পাওয়া যায়। বেশ কিছু গবেষণার পর দেখা যায়, এগুলো প্রায় ৩০ থেকে ৪০ হাজার বছর আগের। জার্মানির সেই উপত্যকার নামেই তাদেরকে 'নিয়ান্ডারথাল' প্রজাতির মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আরও ধারণ করা হয় ১৭০ হাজার বছর আগে থেকে তারা পৃথিবীতে বসবাস করে আসছিল।

এই ঘটনার পর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আরও কিছু ফসিল আবিষ্কৃত হয়! এরপর থেকে জীববিজ্ঞানীদের চিন্তার মধ্যে নতুন ডালপালা গজাতে থাকে। তারা দেখতে পায়, নিয়ান্ডারথাল প্রজাতির মানুষের দেহ বর্তমান সময়ের মানুষের মতো হলেও এখনকার সময়ের মানুষের মতো কথা বলতে পারত না! তারা অন্য প্রাণীদের মতো শব্দসংকেতের মাধ্যমে কিংবা বিভিন্ন ইশারা-ইঙ্গিতে একে অপরের সাথে ভাববিনিময়ের দ্বারা জীবন পরিচালনা করত।

দীর্ঘ গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা যেহেতু বলতে পারল—নিয়ান্ডারথাল কথা বলতে পারত না, তাহলে বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে এই প্রশ্নও তৈরি হয়—তাহলে বর্তমান

সময়ের মানুষ কীভাবে কথা বলা শিখল? যদিও এটার একটা ব্যাখ্যাও তারা দাঁড় করিয়েছে। *Sapiens* গ্রন্থেই বিজ্ঞানী Yuval Noah Harari বলেছেন—

'৭০ থেকে ৩০ হাজার বছর সময়ের মধ্যে মানুষের মগজে এক বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লব ঘটে যায়! সৃষ্ট বিপ্লবের এই কারণটি একেবারেই অজানা। তবে অধিকাংশই এই থিওরিতে একমত যে, এটা ছিল মগজের মধ্যে একটি Accidental Genetic Mutations Change তথা 'দুর্ঘটনাজনিত জেনেটিক পরিবর্তন!' মানুষের মগজের এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনের ফলে তাদের মধ্যে চিন্তার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু একে অপরের সাথে যোগাযোগের নতুন মাধ্যম হিসেবে তাদের মতো করে একটি নতুন ভাষারও সৃষ্টি হয়ে যায়।'[২]

উপরিউক্ত কথাটি প্রমাণিত বিষয় নয়। এটি বিজ্ঞানীদের একটি থিওরিমাত্র। আর থিওরির মানে হলো, বিষয়টি এখনও প্রমাণিত হয়নি। কেননা, মানুষ কীভাবে কথা বলা শিখল—বিজ্ঞানের ভাষায় বিষয়টি বোঝার জন্য আপাতত এই থিওরির চেয়ে সুন্দর কোনো জবাব বিজ্ঞানীদের কাছে নেই!

তবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য—তাদের জীবন পরিচালনায় অভূতপূর্ব সফলতার পেছনে—কথা বলা কিংবা ভাষার একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে; আর বিজ্ঞানীরা সে বিষয়টি প্রমাণও করতে পেরেছে। বিশ্বসভ্যতার আজকের সময়ের মানুষের যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন, তা মানুষ কবে থেকে,

---

[২] প্রাগুক্ত

কীভাবে, কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পেয়েছে? সেসব তথ্যাদি আজও প্রমাণিত হয়নি।

বিজ্ঞানের দাবিমতে, ৭০ থেকে ৩০ হাজার বছরের মধ্যে কোনো এক দুর্ঘটনার আলোকে মানুষ কথা বলার দক্ষতা অর্জন করেছে। দুনিয়ার বস্তুগত দর্শনে দেখা যায়, দুর্ঘটনার মাধ্যমে কখনো সৃষ্টিশীল বিষয়ের অবতারণা হয় না; বরং নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কিন্তু পৃথিবীতে আগে থেকেই ইতর প্রাণী হয়ে বসবাস করা মানুষের ওপর কী এমন দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যার প্রভাবে তারা সভ্য ও বিচক্ষণ হয়ে গিয়েছে! আর এমন একটি দুর্ঘটনা মানুষের জন্য আবার ইতিবাচকও হয়ে গেল!

আবার পরবর্তী ৩০ হাজার বছরের পর থেকে আজ পর্যন্ত তেমন আরেকটি ঘটনা কিংবা তার কাছাকাছি কোনো দুর্ঘটনার নজিরও তো দেখা যায়নি, যার ফলে মানুষের মতো আরেকটি বুদ্ধিমান প্রাণীর সৃষ্টি হতে পারে! যাহোক, বিজ্ঞান গবেষণা করে তাদের মানদণ্ড অনুযায়ী, সেখানে যৌক্তিক যুক্তি ও বিচারের উপস্থিতি থাকে খুবই সামান্য। এইসব বিতর্কে জড়িয়ে সামনে আগালে এই তর্কের ইতি টানা যাবে না। পুরো বিষয়টিই ধারণাতত্ত্বের ওপর ঘুরপাক খেতে থাকবে।

মানুষ যেভাবে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করল

মানুষ ব্যতীত পৃথিবীতে অন্য কোনো প্রাণীর বাক্‌শক্তি নেই, কথা বলতে পারে না! মানুষের এই বাড়তি যোগ্যতার কারণে পৃথিবীতে শিল্প, সাহিত্য, কলা, সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে।

একজন মানুষ তার মনের কথা লেখনীর মাধ্যমে এবং কর্মের দ্বারা অনাগত হাজার বছরের মানুষের জন্য রেখে যেতে পারে। এই সুযোগ অন্য কেউ পায়নি। আর মানুষের এমন যোগ্যতা অর্জনকে বিজ্ঞানীরা বলেছেন—Accidental Genetic Mutations Change.

কথা বলতে পারাটাই যেখানে মানুষের শ্রেষ্ঠতম যোগ্যতার অন্যতম একটি দিক। সেটা কীভাবে মানুষ পেল, সে ব্যাপারে পবিত্র কুরআন বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যার সাথে পরিষ্কারভাবে দ্বিমত পোষণ করেছে! তা ছাড়া মানুষের কথা বলতে পারাটা, হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো দুর্ঘটনার বিষয় নয়; বরং পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মানুষকে বৈশিষ্ট্যগতভাবেই কথা বলার যোগ্যতা দান করা হয়েছে। এটি সৃষ্টির মধ্যে ব্যতিক্রম এবং সৃষ্টিকুলের মধ্যে অতীব আশ্চর্যজনক ঘটনা। স্বয়ং আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

> ‘পরম করুণাময় আল্লাহ। যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিখিয়েছেন।’[৩]

---

[৩] সূরা আর-রহমান ১-৪